# পরমার্থবিদ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

বাণী চক্রবর্তী

(১৭)

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ সোমবার। আজ ৭টা ৪৫মিনিট। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গোলবারান্দায় নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। তারপর স্বকীয় ভঙ্গিমায় সকলকে পরমাত্মবোধে প্রণাম করে সৎপ্রসঙ্গ শুরু করলেন—

আমরা পাগলা ঘন্টির কথা যে কাল শুনলাম, তা শুনলে সবাই যে যেখানে থাকে সেখান থেকে ছুটে আসে। যারা আসবে তাদের সঙ্গে পাগলা ঘন্টির একটা সম্পর্ক আছে। এই পাগলা ঘন্টির এই নির্দেশ এক একটা organization-এর ব্যাপার। আমাদের inner organization-এর মধ্যেও এরকম একটা বোঝাপড়া হয়ে আছে। স্মৃতির পর স্মৃতি জমে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক একটা তৈরি হয়ে থাকে। কথাগুলি বোধের স্মৃতি ধরে জমে একত্র হয়ে আপনবোধ হয়, যার সঙ্গে প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সম্পর্ক হয়। তা বাড়তে বাড়তে বিশ্বের অন্যান্য জিনিসের মধ্যেও 'স্বভাব' তৈরি হয়। এই স্বভাবের বিজ্ঞান। তখন পাগলা ঘন্টি বাজলে যে যে বৃত্তি যেখানেই থাকুক ছুটে আসে। Boarding-এ যেমন খাবার ঘণ্টা বাজলে সবাই একসঙ্গে খেতে আসে ঠিক তেমন। Military camp-এ যেমন সর্ব ব্যাপারে কঠিন নির্দেশ মেনে চলতে হয়— খাওয়া-দাওয়া, parade করা ইত্যাদি। এই অভ্যাস আমরা করি না বলে অসুবিধা হয় মাঝে মাঝে। ঈশ্বরীয় পথে discipline খুব দরকার। তাই মহাপুরুষরা প্রথমেই কতগুলি নিয়ম করে দেন। যাদের নিয়ম মতো জীবনযাপন করার অভ্যাস আছে তাদের তা দরকার হয় না। যাদের সেই অভ্যাস নেই তাদের এই নিয়ম মেনে চলতে চলতে কতগুলি সদ্‌গুণ তৈরি হয়। এর ফলে অসুবিধা দূর হয় এবং নতুন গুণ তৈরি হয়। তার ফলে ক্রমশ বৃহতের দিকে যেতে সুবিধা হয়।

'শ্রীবৃদ্ধি হোক'— এরকম একটা আশীর্বাদ করার রীতি প্রচলিত আছে। এই 'শ্রী'-র অর্থ কিন্তু খুব ব্যাপকভাবে ধরা হয়। শ্রী-র একটা অর্থ হল বাইরের অর্থসম্পদ ও ঐশ্বর্য, এ হল স্থূল অর্থ। আরেকটি অর্থ হল মূল প্রাণের অভিব্যক্তি, তা-ই হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অধ্যাত্ম পথে এই শ্রী বৃদ্ধি এক একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে হয়। তা-ই হল এই পথে এগোবার প্রথম উপায়। যে যতটা নিয়ম মেনে চলতে পারে বা অভ্যাস করতে পারে, তার তত বিকাশ হয়। এই হল অন্তরের সম্পদ। বাইরের সম্পদ বাড়লে অনেকসময় বিপদ হবার আশঙ্কা থাকে। অন্তরের সম্পদ বাড়লে বিপদ নেই। অন্তরের সম্পদ বাড়লে বাইরে না জানালেও চলে। গ্রহণশক্তি ও পরিবেশনশক্তি সবই হল অন্তরের সম্পদ।

সর্বাঙ্গীন পুষ্টি হল আধ্যাত্মিক পথের লক্ষ্য। ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তির পথের উদ্দেশ্য হল জীবনে সর্বাগ্রে একটা balance তৈরি করা। দেহ-মন-প্রাণ সবের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হলে বাইরের চঞ্চ লতা অস্থিরতা কম হয়। বাইরে বিরোধ দ্বন্দ্বও কম থাকে। বাইরে দ্বন্দ্ব-বিরোধ যতই হোক না কেন সে অন্তরে কিন্তু একটা ধীর স্থির শান্ত ভাব maintain করতে পারে। পারিবারিক জীবনে ঘরে বসে ঈশ্বরের সাধনা সম্ভব— এই নির্দেশ যদি কেউ দেন এবং সেই নির্দেশ যদি কেউ মেনে চলে তবে development তার হবেই। এই ঘরে বসে অধ্যাত্ম সাধনা জীবনে একটা সময়ে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধ দেবের সময় দেখা গেল যে সবাই গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে ভিক্ষু হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল। এর ফলে সমাজজীবন পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম হল। শংকরের জীবনেও তা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি একটু পালটে নিলেন। সব ত্যাগের দিকে শংকর জোর দিলেন— সংসার ত্যাগ, বস্তু ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ, আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ। এত তীব্রভাবে ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্য সমাজের জীবনে ভীষণ disturbance এল। সকলেই সাধন-ভজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাই পরে নতুন করে চৈতন্যদেব এসে আবার সংশোধন করে দিলেন। সমাজ বা গৃহস্থকে disturb করে যে আধ্যাত্মিক সাধনা, তা উচিত নয়। তা সর্বাঙ্গীন সাধনা নয়। সুসন্তান যদি না হয় তবে সাধনার ধারা কারা বজায় রাখবে! সংসারকে



©Saccidananda Society, Kolkata. Website: SaccidanandaSociety.org

সর্বাঙ্গীনভাবে পুষ্ট করা হল ধর্মের লক্ষ্য। তা-ই ছিল ঋষিযুগের আদর্শ। তাঁরা সমাজের কোনো ব্যবস্থাই বাদ দেননি, ফলে একের পর এক এসে সর্বাঙ্গীনভাবে পুষ্টি লাভ করে ঠিকমতো ধারা বজায় রেখে গিয়েছিলেন। ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা যা শুনি তা সমাজজীবনে মস্ত বড় ঘুন ধরিয়ে গেছে। এর জন্য পরে শংকরকেও বিচলিত হতে হয়েছিল।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, এই নিত্যানন্দকে আবার বিয়ে করতে পাঠালেন তাঁর এই ভুল সংশোধনের জন্য। ত্যাগের বাণী ও ধারার দু-রকম অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের যুগে কিন্তু তিনি একবারও ত্যাগের কথা বলেননি। তাঁর সেই নির্দেশ কিন্তু কেউ নেয় না অথচ সবাই শ্রীগীতা পড়ে। শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ যে যেখানে যে কর্মে রত আছে সেখানে সেই কর্ম করেই ইষ্ট লাভ করতে পারে। কিন্তু তা না করে সকলে পরধর্ম নেবার জন্য ব্যস্ত। যিশু পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করলেন। তখন ধনী লোকেরা খুব অত্যাচার করত, তারা অপরকে পীড়ন করত। অর্থের প্রাচুর্যে মানুষ ভীষণভাবে নিষ্ঠুর ও খামখেয়ালি হয়ে গিয়েছিল। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি বলেছিলেন— সব কিছু ত্যাগ করে যে তাঁর কাছে আসবে তার জন্য স্বর্গের পথ খোলা থাকবে। তখন সমাজব্যবস্থা এমন হয়েছিল যে এরকম নির্দেশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং সেইজন্যই যিশু এই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দেশে এই নির্দেশ কেউ নিল না, সব কিছু ত্যাগ না করে ভোগের মধ্যে ডুবে গেল সবাই। আমাদের দেশে আবার শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ না করে যে যেখানে যেভাবে আছে সেখানে থেকেই নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে বা সব কিছু ঈশ্বরবোধে ভোগ করার কথা বা নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কথা না মেনে সবাই ত্যাগের পথ ধরল। ঈশ্বরের ধর্ম, তাঁর যে উদ্দেশ্য তা কখনো অকল্যাণকর হতে পারে না। আমরা তা সঠিকভাবে না জেনে ঠিকমতো পালন করি না বলেই ব্যবহার বিজ্ঞানে ত্রুটি আসে।

এযুগে মহাপুরুষদের নির্দেশ হল— যে যেখানেই থাক শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস এই তিনটি উপাদান অবলম্বন করে চললে সবাই উপকার পাবেই। প্রথমে সকলেরই একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু তা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবেই। যারা সীমাবদ্ধ জ্ঞান অস্থির চঞ্চল চিত্ত নিয়ে কর্ম ও ভোগে মত্ত, হিংসায় উন্মত্ত, দ্বন্দ্ব বিরোধ নিয়েই আছে, তারা কখনো শান্তি পাবে না। তাদের শান্তির footing নেই, এদের নিম্নপ্রকৃতি। এরা কর্ম করছে, রোজগারও করছে কিন্তু ভোগ করে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে, কারণ যথার্থ ব্যবহার তারা জানে না। আধ্যাত্মিক পথে শেখায় প্রতিটি বস্তুর যথার্থ ব্যবহার বিজ্ঞান। যথার্থ ব্যবহার বিজ্ঞান না জেনে ব্যবহার করলে কিছুটা অপচয় হয় এবং তার ফলে বাইরে তার অভাব হয়। নিজের ভিতরে অসুখ হবে এবং আত্মীয়স্বজন তার জন্য উদ্‌গ্রীব ব্যস্ত ও চিন্তিত হবে। এর ফলে অপরের চিন্তাভাবনার কারণ হয়ে পড়ে। এই ত্রিবিধ ব্যবহারদোষ— অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিশ্বাস হল সত্যের বিরোধী। যারা সত্যের পথে চলতে চায় তাদের এই ত্রিবিধ দোষ যাতে না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়।

সঞ্চয় গৃহীদের করতে নিষেধ নেই। সন্ন্যাসীর যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করাতে নিষেধ নেই, গৃহীরও অর্থ সঞ্চয় করা দোষের নয়, তাতে কোনো নিষেধ নেই। নিজের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু রেখে পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে কিছু কিছু দাও। তোমরা দুস্থ প্রতিবেশী/আত্মীয়স্বজনকে দিও। তা করলে তাদেরও সেবা করা হয়। আমি যদি অপরের সেবা না করি, তবে আমার প্রয়োজনের সময় সেও সাহায্য করবে না।

**বুদ্ধদেবের সময় দেখা গেল যে সবাই গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে ভিক্ষু হয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল। এর ফলে সমাজজীবন পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম হল। শংকরের জীবনেও তা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি একটু পালটে নিলেন। সব ত্যাগের দিকে শংকর জোর দিলেন— সংসার ত্যাগ, বস্তু ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ, আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ। এত তীব্রভাবে ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্য সমাজের জীবনে ভীষণ disturbance এল। সকলেই সাধন-ভজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাই পরে নতুন করে চৈতন্যদেব এসে আবার সংশোধন করে দিলেন। সমাজ বা গৃহস্থকে disturb করে যে আধ্যাত্মিক সাধনা, তা উচিত নয়। তা সর্বাঙ্গীন সাধনা নয়। সুসন্তান যদি না হয় তবে সাধনার ধারা কারা বজায় রাখবে! সংসারকে সর্বাঙ্গীনভাবে পুষ্ট করা হল ধর্মের লক্ষ্য। তা-ই ছিল ঋষিযুগের আদর্শ।**

©Saccidananda Society, Kolkata. Website: SaccidanandaSociety.org

নিম্নপ্রকৃতির কারণে এভাবেই বিশৃঙ্খলা এসে যায় সংসারে। সদ্‌গুণের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক। সদ্‌গুণ যত বাড়বে ঈশ্বরীয় উপলব্ধিও তত ব্যাপক হবে। মা-কে বলা হয় গুণাশ্রয়ী গুণময়ী। নারায়ণ হলেন সত্যাশ্রয়ী। পরস্পরের সঙ্গে মিল না হতে পারলে অখণ্ডবোধে কী করে আসবে? এই ব্যবস্থা যখন ভেঙে যায় তখন সাধকরা এসে তা ঠিকঠাক করে দিয়ে যান। আবার যখন আবরিত হল, তাঁরা এসে নির্দেশ দিয়ে সব ঠিক করে দিয়ে যান। এইভাবেই তাঁরা বার বার আসেন।

বিদ্বেষভাব নিম্নপ্রকৃতির প্রভাবে আসে। ঊর্ধ্বপ্রকৃতির লোকের মধ্যে যখন নিম্নপ্রকৃতির দোষগুলি আসে তখন সেগুলিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তোমার মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ষড়রিপু আসবে, কিন্তু এগুলিকে প্রশ্রয় দিও না। ঊর্ধ্বপ্রকৃতির গুণগুলিকে গুরুত্ব দিলে নিম্নপ্রকৃতির দোষগুলি কাছে আসবে না। মহাপুরুষরা নিম্নপ্রকৃতির লোকেদের তাড়ায় না। একটু একটু করে ধীরে ধীরে কত কষ্ট করে তাদের তাঁরা mould করে দিয়ে যান। প্রচেষ্টা বন্ধ করতে নেই। Result-এর কথা না ভেবে কর্ম করে যেতে হবে সকলকে। চাষি যদি আগেই কত শস্য হবে, এসব কথা ভাবনা ক'রে কাজ করে তবে কোনোদিন ফসলই হবে না। যে চাষি ফসলের কথা না ভেবে ঠিকমতো তার জমি চাষ করে বীজবপন করে, ভালো result সে পাবেই। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রেও সাধনার ফলের দিকে যেন নজর না যায়— তা তাঁর হাতেই থাক। কর্ম যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে ঠিকমতো হয় তা দেখা উচিত। ফল কী হবে না হবে তা ভাবতে গেলে ত্রুটিহীন কর্ম হয় না। কিছুটা অভ্যাস করা, কিছুটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়— এর ফলে একটা unity আসে। ঈশ্বরীয় উপলব্ধির পথে প্রত্যক্ষ যেটা, তা আগে ধরিয়ে দিতে হয়। পরে তার অন্তরের বোধ ধীরে ধীরে আপনিই হবে। তাই বস্তুর ব্যবহার আগে শেখাতে হয়, তারপর বিষ্ণুর জ্ঞান হয়। মহাপুরুষগণ তা ধরিয়ে দেন বার বার কারণ আমরা তা ভুলে যাই। তারা যথার্থ অর্থ ধরিয়ে দেন। এভাবে সত্যার্থ স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়। স্মৃতিগাঁথা হয়ে গেলে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস আপনিই আসবে। এগুলি প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। আমরা নির্ভর করতে পারি না, ফলে সামান্য দু-তিনবার একটু ডাকবার পরেই বলি কোনো কিছুই তো হল না। যত ফলের দিকে লক্ষ্য থাকবে, কর্ম তত ত্রুটিপূর্ণ হবে। কর্ম যত সুষ্ঠুভাবে করার দিকে দৃষ্টি যাবে ফল তত ভালো হবে। যে কর্মই কর ফলের দিকে নজর না নিয়ে মনে রাখবে ঈশ্বরের নির্দেশে এই কাজ করছ, সুষ্ঠুভাবে যেন কর্ম করতে পার এই প্রার্থনা তাঁর কাছে কর। ঈশ্বর যা করবার তা করবেনই। যতরকম সাধনা আছে তার মধ্যে এভাবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। তা মানতে হয়, এই বিশ্বাস না নিয়ে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

দুঃখ-কষ্ট অভাব অভিযোগ— এসবের জন্য ঈশ্বরকে ডাকা যাচ্ছে না— এই ভাব ঠিক নয়। তিনি বার বার বলছেন ঈশ্বরের নাম নিয়ে যে কাজ করে, ঈশ্বরের উপর যে সব ভার ছেড়ে দেয়, তার প্রয়োজনীয় বস্তু তিনিই যুগিয়ে দেন আবার। দুঃখ-কষ্ট তুমি কতটা ভোগ করছ এবং তাঁর জন্য কাজ করছ অথবা নিজের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে করছ কী না তা তিনি জানেন। তাঁর জন্য কাজ করলে ঠিক ঠিক ভাবে তিনি কৌশলে বিপদ কাটিয়ে দেন— এরকম দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়েছে। তিনি যে প্রতিনিয়ত সকলের জন্য করে যাচ্ছেন— এই জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ যত বাড়বে তাঁর কৃপাও ততবেশি পাওয়া যাবে। বিপদ-আপদ এলেও তাকে তিনিই রক্ষা করবেন। অকৃতজ্ঞ হলে তিনি আবার সরেও যান। তিনি আছেন বলেই আমরা আছি। আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে সেই বৃহৎ শক্তির উপর। সুস্থভাবে প্রতি মুহূর্তে যে বেঁচে আছে সবাই, তা হল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপা। আমার জীবন প্রতিটি মুহূর্তেই নির্ভর করছে অন্য সবার উপর। নাম আমাদের ভিতর হয়, অন্তত একবার/দু-বার যা-ই করুক না কেন, এর মানে তিনি প্রকাশ হচ্ছেন তার মধ্যে। এটুকু ধরতে না পারলে, না মানলে বাকিটুকু প্রকাশ হবে না। নাম হল তাঁর প্রথম আবির্ভাব, তা আপনিই ফুটে ওঠে। নামের সঙ্গে মহাপুরুষরা সব দেন। বিশ্বাসও নামের সঙ্গে রয়েছে। ইট চুন সুরকি সিমেন্ট এলেই বাড়ি তৈরি হয় না, গাঁথুনিকার-কে দিয়ে গাঁথতে হবে। সেইরকম শুধু নাম পেলে হবে না, তা ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে। জীবনে চলার পথে যথার্থভাবে তাঁকে মনে রেখে চলাই হল আমাদের করণীয়। যে যেরকম ব্যবহার করবে সে সেরকম প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করবে। তার মধ্যে সেরকম সত্যের ভিত তৈরি হবে। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। যাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তারাই এমন কথা বলেছেন।

কর্ম ঠিকমতো হলে ভিতরে আত্মপ্রসাদ আসবেই। এই আত্মপ্রসাদ, আনন্দ বড় দুর্লভ। একটা পরম নিশ্চিন্ত ভাব আসে। কাজ বন্ধ করে রাখলে, অসমাপ্ত রাখলে আর পাঁচজন দোষত্রুটি



©Saccidananda Society, Kolkata. Website: SaccidanandaSociety.org

ধরে। এর ফলে relief আর হয় না। নাম ধরে সাধনা হল শ্রেষ্ঠ সাধনা। নামে বিশ্বাস রেখে কাজ করা শুধু। কেউ যদি ঠাট্টা করে বলে— এ তুমি কী করছ? নাম করে কী লাভ হবে তোমার? এই ধরনের কথা শুনলে তার উত্তরে কড়া কিছু বলতে নেই। চুপ করে এড়িয়ে যেতে হয়, অথবা শান্তভাবে বলবে যে, 'আমি যে আর কিছু জানি না'। এই ভাবেই চলবার ব্যবহার কৌশল একটা আছে, তা শিখে নিতে হয়। কারোকে আঘাত না দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা বাক্‌কে ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানি না। তাই অনেকসময় আমরা অশোভনভাবে কথা বলে ফেলি। ত্রুটি এসে গেলে ভুল বোঝাবুঝি এসে যায়, তাই বাক্ সংযমের কথা বলা হয়। ব্যবহারবিজ্ঞান জানা থাকলে অনেক অশান্তি দূর হয়। যা আমাদের কাছে তাই ব্যবহার করব অপরের অসুবিধা না করে। বাক্ সংযমের দ্বারা অপরের অসুবিধা না করে ক্রমে ক্রমে অনেক বিরোধ কমে যায়। অনেক অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অন্তরের সম্পদকে সযতনে রাখতে হয়। অন্তরের সম্পদকে মন ও প্রাণের বৃত্তি দ্বারা মলিন করে ফেলো না। যে কাজই হোক, কোনো কর্মই খারাপ নয়, যদি ঈশ্বরের নামে হয় এবং তাঁর কাছে অর্পিত হয় বা কর্মের ফলও তাঁর নামে দেওয়া হয়। গুণ্ডামি চুরি মারামারি যা-ই হোক তাঁর নামে হলে বন্ধন নেই। এই হল কর্মের রহস্য। কর্তৃত্বাভিমান দিয়ে কাজ করলে বৃহত্তর কর্মও অকর্ম হয়ে যায়। নিরভিমান হয়ে খারাপ কাজ করলেও তা সৎ কর্ম হয়ে যায়। সব কিছু নিজ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। মহাপুরুষরা নিরভিমান নিরহংকার থাকেন বলে তাঁদের মধ্যে প্রশান্তি সরলতা শান্তি প্রেম জ্ঞান আনন্দ সহজ উদার ভাব প্রকাশ পায়। তাঁরা হয়তো শাস্ত্রে উল্লিখিত শ্লোক মুখস্থ বলতে পারেন না, কিন্তু জীবনের সঠিক ব্যবহার বিজ্ঞান জানেন। একেই বলে কর্মের বিজ্ঞান। সমস্ত কর্মের কৌশল নিপুণতা তাঁরা ধরিয়ে দেন। আমাদের কর্মময় জীবন, কর্ম ছাড়া চলবে না। তাহলে অপরের গঞ্জনা-লাঞ্ছনা এ তো সইতেই হবে। কর্ম ছাড়া ধ্যান-জপ করতে নেই। তাহলে বিকার আসে। এক সময় নাম করবে আবার অন্য সময় বৃত্তির পর বৃত্তি উঠবে মনে, তাহলে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়। এর ফলে unbalanced হয়ে যায়।

একজন retired officer এক মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— কাজকর্ম তো শেষ হল, এখন কী করব? মহাপুরুষ বললেন— কাজ কি শেষ হয়! Officer— office-এর কাজ তো শেষ হয়ে গেল। মহাপুরুষ— এক office-এর কাজ শেষ হল, কিন্তু অন্য office-এর কাজ আছে। তোমার জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি যা আছে তা দিয়ে অন্য কাজ কর। পরিজন/আত্মীয়স্বজনদের জন্য কাজ কর, যারা দুঃস্থ তাদের সাহায্য কর। পরিশ্রমশূন্য দেহ রেখো না।

বিবেকানন্দের মুখ থেকেও এই ধরনের কথা বেরিয়েছিল দ্বিতীয়বার বিদেশ যাওয়ার আগে। অন্যান্য সাধু গুরুভাইরা এসে তাঁকে বলেছিল— তুমি বিদেশে যাচ্ছ, তার আগে একটা

**একজন retired officer এক মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— কাজকর্ম তো শেষ হল, এখন কী করব? মহাপুরুষ বললেন— কাজ কি শেষ হয়! Officer— office-এর কাজ তো শেষ হয়ে গেল। মহাপুরুষ— এক office-এর কাজ শেষ হল, কিন্তু অন্য office-এর কাজ আছে। তোমার জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি যা আছে তা দিয়ে অন্য কাজ কর। পরিজন/আত্মীয়স্বজনদের জন্য কাজ কর, যারা দুঃস্থ তাদের সাহায্য কর। পরিশ্রমশূন্য দেহ রেখো না।**

নির্দেশ দাও আমাদের। আমরা কীভাবে ধ্যান-জপ করব! বিবেকানন্দ— বেশি ধ্যান করিস না। বিশ্বাস রাখিস, ঠাকুরের কাজ যে যেরকম পারিস সেইমতো করিস। দেহ দিয়ে যতটা পারা যায় খাটিস। যা জোটে তা নিবেদন করে খেয়ে নিস আর কিছু দরকার নেই।.... সবাই অবাক, তারা ভেবেছিল তিনি ধ্যান করার নির্দেশ দেবেন। পরে তারা বুঝল যে এছাড়া দেহ-মন সুস্থ রাখার অন্য কোনো উপায় নেই। দৈহিক পরিশ্রম করলে নিদ্রাও ভালো হয়। নিদ্রার মধ্যেই দেহ-মনের পুষ্টি হয়। পরিশ্রম করে যে অন্ন খাও তা সহজে হজম হয় আর পরিশ্রম না করে যে অন্ন খাও তা সহজে হজম হয় না। বিবেকানন্দ সত্যকে ওতপ্রোতভাবে জীবনে অনুভব করেছিলেন। যারা ঠিকমতো এই সব নির্দেশ পালন করতে পারবে তারা উপকার পাবেই। দেহ-মন ঠিক না থাকলে কীভাবে সৎ চিন্তা করবে! সব দিকে balance রেখে চললে দেহ-মন-প্রাণ-বোধে আপনিই setting একটা এসে যায়।



©Saccidananda Society, Kolkata. Website: SaccidanandaSociety.org

আমরা তাঁকে যতটা চাই তার চাইতে বেশি উদ্‌গ্রীব তিনি আমাদের তাঁর কাছে নেবার জন্য। নির্মল সুন্দর পবিত্র করে তবে তো তিনি আমাদের নেবেন। তাঁকে না-মানলে ভালো ফল পাওয়া যায় না। জীবন গঠনের জন্য যত শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন আছে সব শিক্ষাতেই ত্রুটি আছে কারণ আমাদের শিক্ষার মধ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস নেই। এগুলি হল শিক্ষার মূল উপাদান। সত্য সম্বন্ধে এক গৃহস্থ সাধক বড় সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলতেন— ভগবান তো আমাদের হাতে বাঁধা রয়েছেন। তিনি কর্মস্বরূপ। কর্মের মধ্যেই তাঁর স্পর্শ পাচ্ছি। এই কথা শুনে অনেক সাধু সন্ন্যাসীরাও বলেছেন, এমন সুন্দর কথা তো শুনিনি আগে! সেই গৃহস্থ সাধকের জীবন অতি সহজ সরল ছিল। তিনি কারোর মধ্যেই নিন্দনীয় কিছু বা কোনো দোষ দেখতেন না। কেউ তাঁকে নিন্দা বা গালাগালি করলে তিনি হাসতেন ও বলতেন— তোমাদের মতো যেন হতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। তিনি কখনোই বলতেন না যে, আমার মতো তোমরা হও। এই হল যথার্থ কর্মযোগী, কারোর ভিতরে তিনি কোনো দোষ দেখতেন না। আমরা উলটোটা করি, নিজের ভাব অন্যের উপর impose করতে চাই। তা মস্ত ভুল।

সবাইকে যথার্থ মান দেওয়ার অভ্যাস করা সবচেয়ে আগে দরকার। মুখে না পারলেও অন্তরে যেন মান দিতে পারি। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ কমে যায় অনেক। কেউ যদি গরম হয়, তবে তুমি হও নরম। দু-জনেই গরম হলে friction হবেই। নরম হওয়া মানে দুর্বলতা নয়। অন্যজন যাতে ক্ষিপ্ত না হয় সেইজন্য নিজেকে সংযত করা। যে সদ্‌গুণগুলির কথা আগে বলা হয়েছিল সেগুলি বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে নেই। আজকাল মানুষের সাধ হয়েছে অনেক, কিন্তু সাধ্য বড় কম। এসব ক্ষেত্রে জোর করে setting করা যায় না। Imposition, conversion এই দুই ভাব আগে ত্যাগ করতে হবে। এভাবে ধর্ম লাভ হয় না। জোর করে কিছু করতে গেলে friction হয়। আমি যদি তাকে উত্তরে যেতে বলি তবে সে দক্ষিণে চলতে থাকবে।

আমাদের দেশ কখনো ধর্ম প্রচার করেনি, অন্যান্য ধর্ম প্রচার করেছে। ধর্ম প্রচারের জিনিস নয়। একমাত্র বিবেকানন্দ America-তে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার একটা বিশেষ কারণ ছিল, প্রচারটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দুধর্মের যে জিনিস আবৃত হয়েছিল, আঘাতে আঘাতে যা ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল সেই আবরণ শুধু সরিয়ে দিতেই তিনি গিয়েছিলেন। সেখানে অলক্ষ্যের প্রভাবেই গিয়েছিলেন, নিজের ইচ্ছায় যাননি। ওই দেশের একদল ধর্ম পিপাসু আসল সত্যকে জানার প্রচেষ্টায় ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাই সদাশ্রিত আধারের মাধ্যমে ঈশ্বরই তাঁর মধ্যে উদয় হয়েছিলেন। তা প্রচার ছিল না। আমেরিকাবাসীকে জাগ্রত করার জন্য বিবেকানন্দ উদয় হয়েছিলেন। আমাদের দেশ তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা পেয়েছিলেন তিনি ওই দেশে।

সত্যের প্রকাশ এক জায়গায় হয় না। বার বার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তিনি আসেন প্রয়োজনমতো। চীন দেশে এই অবস্থা আজকাল, ও দেশেও মহাপুরুষকে উদয় হতে হবে। তাদের দেশেও নিষ্কাম কর্মীর কথা শোনা যায়। চীনের এক মহাপুরুষের উক্তি— জীবনকে কেন্দ্র করে যেমন সব জিনিস সংগ্রহ করা হয়, পরিবারকে কেন্দ্র করে যেমন পাঁচজন, তেমন বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে একটা একান্নবর্তী পরিবার গড়ে ওঠে। এই ব্যাপক উদার দৃষ্টিভঙ্গি মহাপুরুষ ছাড়া কারোর হয় না। God-এর কথা হয়তো তিনি বলেননি, কিন্তু সত্যের অনুভূতি তাঁর ঠিকই হয়েছে। বুদ্ধদেবও কোথাও ঈশ্বরের কথা বলেননি। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও একবার মাত্র ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়। তিনি এত বড় ঋষি হয়েও শুধু যোগের কথাই বলে গেছেন আগাগোড়া। প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায় যে পরে ভক্তি প্রকাশ হয়েছে।

ভক্তি সর্বসাধারণের জন্য। অন্যান্য পথে যে সব strict discipline আছে তা মানা শক্ত। সবার পক্ষে তা সম্ভবও নয়। গৃহীদের মধ্যে সর্বসাধারণের কাছে ভক্তি সহজ সরল ভাবে গ্রহণযোগ্য। ভক্তি সহজসাধ্য, প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। তা সহজে ধরা চলে, কোনো কঠোরতা পালন না ক'রে। তাই তাকে আনন্দের সাধনা বলে। পূজা-অর্চনা করা— এগুলো তাঁরই অভিব্যক্তি। তাঁকে কেন্দ্র করে আমরাও মাতি এবং তিনিও মাতেন। এভাবে দু-পক্ষেরই যোগাযোগ হয়। প্রিয়জন ছাড়া তো আনন্দ হয় না। তাই প্রিয়বোধে ভগবানকে গ্রহণ করা হয়। এভাবে প্রীতিবোধ এসে যায়।

আজ এখানেই সৎপ্রসঙ্গ শেষ করলেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর। ধীরে ধীরে তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই প্রসাদ নিয়ে আপন আপন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

ক্রমশ



©Saccidananda Society, Kolkata. Website: SaccidanandaSociety.org